ভোটার তালিকা তৈরীর প্রস্তাবিত পদ্ধতির ত্রুটি এবং একটি বিকল্প প্রস্তাব

আ হ্ সা ন মো হা ম্ম দ

নির্বাচনের পূর্বশর্ত হচ্ছে ভোটার তালিকা, অথচ তার উপর থেকে রাহুর দশা কোন ভাবেই কাটছে না। ছবিসহ ভোটার তালিকা ও ভোটার আইডি কার্ড প্রস্তুতের কাজ কিভাবে করা হবে নির্বাচন কমিশন তার বিস্তারিত এখনও স্থির করতে পারেনি এবং তা এখনও জাতির সামনে স্পষ্ট করে বলা হয় নি। কিছুদিন আগে হঠাৎ করেই জানানো হলো যে, ভোটার তালিকা তৈরী করতে বাড়ি বাড়ি যাওয়া হবে না, বরং ভোটারেররা নিকটস্থ ক্যাম্পে গিয়ে নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশন করবে এবং তথ্য প্রদান করবে। কয়েকদিনের মাথায় আবার তা পরিবর্তন করে বলা হচ্ছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফরম দিয়ে আসা হবে। তবে ছবি কিভাবে তোলা হবে তা এখনও স্পষ্ট করা হয়নি। জাতীয় আইডি, ভোটার আইডি নাকি সাময়িক আইডি তৈরী করা হবে তা নিয়েও অস্পষ্টতা রয়েছে। অপরদিকে হালনাগাদের জন্য আদালতের নির্দেশ থাকা সত্তেও নতুন তালিকা তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এমতাবস্থায় ভোটার তালিকা তৈরীর পদ্ধতি নিয়ে অস্পষ্টতা ও সিদ্ধান্তহীনতা সচেতন নাগরিকদের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। এ পর্যন্ত প্রস্তাবিত পদ্ধতি সম্পর্কে যতটুকু ধারণা পাওয়া গছে, তাতে অনেকেই তাকে বাস্তবায়নযোগ্য মনে করছেন না। খুব বেশী দেরী হবার আগেই এ বিষয়ে বিস্তারিত বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ নীচে আলোচনা করা হয়েছে এবং একটি বিকল্প পদ্ধতির প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনারগণের টুকরো টুকরো কথা যোগ করলে প্রস্তাবিত প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে ধারণা হয়, তা নিম্নরূপঃ

তথ্য সংগ্রহকারীরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে ফরম দিয়ে আসবেন। ভোট কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত ৩০০০ স্থাপনাতে ক্যাম্প স্থাপিত হবে। সেখানে নাগরিকেরা নিজ দায়িত্বে গিয়ে নিজেদের ছবি তুলে আসবেন। ক্যাম্পে এক বা একাধিক তথ্য সংগ্রহকারী ল্যাপটপ নিয়ে বসে থাকবেন। ল্যাপটপের সাথে ডিজিটাল ক্যামেরা সংযুক্ত থাকবে এবং ক্যামেরা থেকে ছবি সরাসরি ডেটাবেজে সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারও ল্যাপটপে থাকেব। তথ্য সংগ্রহকারী ভোটারের ছবি তুলবেন তা ডেটাবেজে এন্ট্রি করবেন এবং একটি সাময়িক আইডি কার্ড প্রিন্ট করে দিবেন। এ পদ্ধতির বাস্তবায়ন কয়েকটি কারণে দুরূহ হতে পারেঃ

ক. সারা দেশে ক্যাম্পের সংখ্যা ৩০০০, অর্থাৎ ১০ কোটি ভোটার ধরা হলে গড়ে ৩৩০০ ভোটারের জন্য একটি ক্যাম্প থাকবে। বাংলাদেশে গ্রামের সংখ্যা ৬৪ হাজার। সে হিসাবে গড়ে ২১ টি গ্রামের জন্য একটি ক্যাম্প। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছবি তুলতে কয়েকটি গ্রাম পার হয়ে ক্যাম্পে যেতে হবে। নিজ অর্থ ব্যয় করে, নদী-নালা-খাল-বিল পেরিয়ে, গ্রামকে গ্রাম অতিক্রম করে ক্যাম্পে গিয়ে লাইনে দাড়িয়ে ছবি তুলতে কতজন নাগরিক উৎসাহী হবেন তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। অসুস্থ ব্যক্তি ও পর্দানশীন মহিলাদের বিষয় তো রয়েছেই। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন ভোটারেরা যেন সন্ধ্যার পর কাজের শেষে ক্যাম্পে যেতে পারে সে জন্য ক্যাম্প সন্ধ্যার পর খোলা থাকবে। গ্রামে রাতের অন্ধকারে ভোটারেরা দল বেধে দু-তিন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ছবি তুলতে যাবে - এটি তিনি কি করে ভাবলেন তা বোধগম্য নয়। সকল ক্যাম্পে কি বিদ্যুৎ সংযোগ থাকবে? থাকলেও

সন্ধ্যার পর যে সেখানে বিদ্যুৎ থাকবে তার নিশ্চয়তা কে দেবে? যেখানে খোদ রাজধানীতে প্রকাশ্য দিবালোকে সন্ত্রাসীরা ছিনতাই করছে এবং গুলি করে মানুষ হত্যা করছে, সেখানে ক্যাম্পে রাতের বেলা ছবি তুলতে যাওয়া নাগরিকদের, বিশেষ করে নারীদের, নিরাপত্তা কে দেবে?

খ. বলা হচ্ছে ক্যাম্পে কর্মীরা ল্যাপটপ নিয়ে বসে থাকবেন। তারা ফরম থেকে ভোটারের তথ্যাদি ল্যাপটপের মাধ্যমে ডেটাবেজে এন্ট্রি করবেন। সেনাবাহিনীর কারিগরি দল জানিয়েছিল যে একজনের তথ্য এন্ট্রি করতে গড়ে আধা ঘন্টার মত সময় লাগবে। শুধু ছবি তুলতে এ সময় কিছু কম হলেও তা খুব একটা কম হবে না। একজন ভোটার আসবে, তার নাম ঠিকানা বলবে, তালিকায় তা খোঁজা হবে, তারপর ছবি তোলা হবে। সব মিলিয়ে আধা ঘন্টাই লেগে যাবে। তাছাড়া বিষয়টি এমন নয় যে প্রতি আধা ঘন্টা পরপর একজন ভোটার ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হবে। দেখা যাবে সারাদিনে কেউ আসে নি, বিকালে অনেকে একসঙ্গে আসলো। অতিরিক্ত গরম কিংবা বরষার দিনে উপস্থিতি খুব কম হবে। অধিকাংশ ভোটার যাবে বিকালে। ফলে দিনে কার্যকরভাবে ৩-৪ ঘন্টা ছবি তোলার কাজ করা যাবে। সে হিসাবে একটি ল্যাপটপে দিনে ১০ জনের ছবি তোলা ও এন্ট্রি করা যাবে। এ কাজ যদি ৩ মাস ধরে এক নাগাড়ে কোন ধরণের ছুটি ছাড়া করা হয়ে থাকে তাহলে একটি ল্যাপটপে ৯০০ জনের তথ্য এন্ট্রি করা যাবে। প্রতি ক্যাম্পে গড়ে সাড়ে তিন হাজার ভোটারের জন্য তাহলে লাগবে কমপক্ষে চারটি ল্যাপটপ। এগুলির সাথে ক্যামেরা সংযুক্ত থাকবে। সে হিসাবে সারাদেশে ৬ হাজার ক্যামেরাযুক্ত ল্যাপটপের প্রয়োজন হবে যার আনুমানিক মূল্য দাড়াবে ১২০ কোটি টাকা। তাছাড়া সাময়িক আইডি কার্ড দেয়ার জন্য লাগবে কালার প্রিন্টার ও ল্যামিনেশন ম্যাশিন। তার জন্য প্রতি ক্যাম্পে আরও লাখ খানেক টাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ক্যাম্পগুলোর জন্যই ১৫০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হবে। এখানে ল্যাপটপের বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টগণকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। একেতো ডেস্কটপ কম্পিউটার থেকে ল্যাপটপের দাম দ্বিগুণের মত, তার উপর ল্যাপটপ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিকতর ব্যয়সাধ্য। একটি ডেস্কটপ কম্পিউটারের কী-বোর্ড বা মনিটরের মত যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে গেলে সুলভে আরেকটি কিনে লাগিয়ে নেযা যায়। কিন্তু ল্যাপটপের ক্ষেত্রে এ ধরণের সুবিধা সীমিত। অপরদিকে ল্যাপটপ নিয়ে অনিয়মের সম্ভাবনা অনেক বেশী। সরকারী খাতের প্রকল্পগুলোতে দেখা যায় প্রকল্প শেষে ক্রয়কৃত ল্যাপটপের কোন হদিস থাকে না। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সহজেই ল্যাপটপটি বাসায় নিয়ে রখে দিতে পারেন। ডেস্কটপের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। প্রকল্প শেষে ল্যাপটপের হদিস না থাকার বিষয়টি নিয়ে প্রচুর অডিট আপত্তিও রযেছে। একই ঘটনা এ ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি হওয়ার কোন কারণ নেই।

গ. পূর্ববর্তী নির্বাচন কমিশন বরাবরের মত নতুন ভোটার তালিকা তৈরীর কাজে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর আওয়ামী লীগের কয়েক ব্যক্তির দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে হাই কোর্ট নতুন ভোটার তালিকাকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং ২০০০ সালের তালিকাকে হালনাগাদ করার নির্দেশ দেয়। ছবিসহ নতুন তালিকা তৈরীর জন্য আইন পরিবর্তন করতে হবে কিনা সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন কোন কিছু বলছে না বা আইনী সমাধানের চেষ্টা করছে না, যা পরবর্তীতে সংকট সৃষ্টি করতে পারে। মনে রাখা দরকার যে বর্তমানের মত সহজ পরিস্থিতি সব সময় নাও থাকতে পারে।

দেখা যাচ্ছে, ভোটার তালিকা ও আইডি তৈরীর পদ্ধতির অনেক বিষয়ে নির্বাচন কমিশন একদিকে যেমন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি, তেমনি ইতোমধ্যে এ বিষয়ে যে সকল সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে প্রকাশিত হয়েছে তার অনেকগুলোই বাস্তবায়ন যোগ্য নয়। তাছাড়া উক্ত ব্যবস্থায় বড় ধরণের আর্থিক অনিয়ম ও সরকারী অর্থ অপচয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্টগণ নিম্নোক্ত বিকল্প পদ্ধতিটি বিবেচনা করে দেখতে পারেনঃ

১. প্রথম ধাপে ফরম নিয়ে প্রথমে বাড়ী বাড়ী গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। নির্ধারিত ফরম ছাপানো ছাড়া এ কাজটি করার জন্য কোন অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয় বা অন্য কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। এ কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই ধাপটি শুরু করে দেয়া যায়। ফরমের সাথে পূর্বে তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংযুক্ত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাহলে যারা নিজেরা ছবি তুলে দিতে চায়, একদিকে তাদের সময় বাঁচবে ও কষ্ট কমবে, অপরদিকে কিছুটা হলেও সরকারের টাকা বাঁচবে। শহরের স্বচ্ছল নাগরিকদরে একটি অংশ এ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করবে। এ ধাপের কাজ আগামী তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন হতে পারে। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার প্রক্রিয়া অনেকটাই সম্পন্ন করা যেতে পারে।

২. নতুন তালিকা তৈরী বা পুরানো তালিকা হালনাগাদ করার পর খসড়া তালিকা স্থানীয়ভাবে তৈরী হতে পারে এবং তার উপর ভিত্তি করে ছবি সংগ্রহের কাজ শুরু করা যেতে পারে। তথ্য ও ছবি এন্ট্রির কাজটি স্থানীয়ভাবে উপজেলা পর্যায়ে করা যেতে পারে। উপজেলা নির্বাচন কমিশন অফিসে এ ধরণের ডেটা এন্ট্রি কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। উক্ত কেন্দ্র থেকে ছবিসহ খসড়া তালিকা প্রিন্ট করা যেতে পারে। প্রতিটি কেন্দ্রে পাঁচটি কম্পিউটারের একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হলে তাতে দিনে দুই শিফটে ১৬ ঘন্টা কাজ করা যাবে। তালিকা হাল নাগাদ করার সিদ্ধান্ত হলে মাত্র পাঁচ কোটির মত ভোটারের তথ্য সংশোধন বা নতুন করে এন্ট্রি করতে হবে। সে হিসাবে প্রতি উপজেলার জন্য গড়ে দশ হাজার ভোটারের তথ্য এন্ট্রি/সংশোধনের প্রয়োজন হবে। পাঁচটি কম্পিউটারে ১৬ ঘন্টা কাজ করা হলে এর জন্য এক মাসের মত সময় লাগবে। খসড়া তালিকার কয়েকটি কপি প্রিন্টার থেকেই বের করে নেয়া যেতে পারে। এ ধাপের জন্য দেড় মাসের বেশী লাগবে না।

৩. ছবি সহ তালিকা বা আইডি তৈরীতে সবথেকে কঠিন ধাপটি হচ্ছে ছবি সংগ্রহ। ছবি সংগ্রহের কাজটিতে ভুলত্রুটি হবার সম্ভাবনা রয়েছে সব থেকে বেশী। gjZt এ কাজটি সঠিকভাবে করতে না পারার কারণে c‡ei ভোটার আইডি প্রকল্প ব্যর্থ হয়। দেখা গেছে এক ব্যক্তির কার্ডে অন্য ব্যক্তির ছবি gv`Z হয়েছে, এমনকি পুরুষ ভোটারের কার্ডে নারীর ছবি কিংবা তার উল্টোটাও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে।

খসড়া তালিকা তৈরীর পর ছবি তোলার কাজ শুরু করা যেতে পারে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফরম পূরণ করার মত বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছবি তোলার কাজটিতে কি সমস্যা বোঝা যাচ্ছে না। খসড়া তালিকা নিয়ে দ্বিতীয় দফা বাড়ি বাড়ি গিয়ে একদিকে যেমন তালিকার তথ্য যাচাই ও সংশোধন করা যাবে, তেমনি ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে আনা যাবে। ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তোলা অনেক সহজ। বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছবি তোলার প্রধান সমস্যা হচ্ছে ছবির মালিক বদল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। অনেক ডিজিটাল ক্যামেরা রয়েছে যেগুলোতে ছবিগুলোর একটি স্বয়ংক্রিয় ফাইল নম্বর পড়ে। তালিকার পাশে ছবির ফাইল নম্বরটি লিখে রাখার মাধ্যমে কোন ছবিটি কার তা সংরক্ষণ করা যেতে পারে। তবে এ পদ্ধতিতে ভুল হবার কিছু সম্ভাবনা থেকে যায়। বিকল্পভাবে, ছবি তোলার সময় ভোটারের গলায় একটি নেমপ্লেট ঝুলিয়ে দিয়ে ছবি তোলা হলে একজনের ছবি অন্যের নামের সাথে সংযুক্ত হবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। পরবর্তীতে নাম সহই ছবি তালিকা ও আইডি কার্ডে ছাপানো যাবে। অথবা, নামের অংশটুকু বাদ দিয়েও ছবি ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা ও ছাপানো যাবে। ভোটারের ছবি ও তালিকা কম্পিউটারে এন্ট্রি করার জন্য যে সফটওয়্যার ব্যবহৃত হবে তাতে ছবির কিছু অংশ বাদ দিয়ে সংরক্ষনের ব্যবস্থা সহজেই করা যেতে পারে। ছবি তোলার জন্য স্থানীয় স্টুডিও গুলোকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়োগ দেয়া হলে ক্যামেরা ক্রয়ের খরচ বাঁচানো যাবে। নীচের ছবিতে নাম সহ তোলা ছবির একটি নমুনা দেখানো হলো।

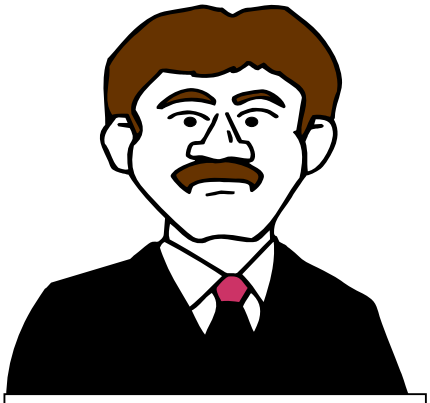

‡gvt kvnv`vZ †nv‡mb
wcZv - †gvt BKevj †nv‡mb

এ ধাপটিতে সর্বোচ্চ মাস দুয়েক লাগতে পারে।

৪. ছবি তোলা হয়ে গেলে তা সিডি বা পেন ড্রাইভে কপি করে উপজেলাস্থ ডেটা এন্ট্রি কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। পাঁচটি কম্পিউটারে ১০ হাজার ভোটারের পূর্বে তোলা ডিজিটাল ছবি এন্ট্রি করতে প্রতি ছবির জন্য পাঁচ মিনিট ধরলেও ১০-১৫ দিনের বেশী লাগবে না। ডেটা এন্ট্রি কেন্দ্র থেকেই ছবি সহ খসড়া তালিকা প্রিন্ট করা যাবে।

৫. ছবিসহ খসড়া তালিকা নিয়মমাফিক বিশেষ বিশেষ স্থানে প্রদর্শন করার পর তা চূড়ান্ত করে কেন্দ্রীয়ভাবে ছাপানো, সিডিতে ও ইন্টারনেটে প্রকাশের ব্যবস্থা করা যাবে।

দেখা যাচ্ছে উপরে প্রস্তাবিত বিকল্প পদ্ধতিতে ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরীতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিয়ে কোন অনিশ্চয়তা থাকছে না, সময় লাগছে কম, তেমনি অর্থ সাশ্রয়ও হচ্ছে। যেখানে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে শুধুমাত্র ক্যাম্পগুলোর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে ১৫০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি, সেখানে বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করলে উপজেলা ডেটা এন্ট্রি কেন্দ্রগুলোর জন্য প্রয়োজন হবে ২০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি। ইউপিএস সহ পাঁচটি কম্পিউটার, একটি লেজার প্রিন্টার সহ ছোট একটি নেটওয়ার্কের জন্য চার লক্ষ টাকার বেশী প্রয়োজন হবে না।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন যে তিনি একটি বুল ফাইটে লিপ্ত হয়েছেন। যে গুরু দায়িত্ব তিনি কাঁধে নিয়েছেন তা সফল ভাবে সম্পন্ন করতে না পরলে যে সমূহ বিপদ তা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু, তিনি এবং তাঁর টিম যে রকম আয়েশী চালে চলছেন, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন এবং 'কাজের থেকে কথা বেশী বলেছেন' তাতে রাজনীতিকরা তো বটেই সাধারণ জনগণও উদ্বিগ্ন না হয়ে পারছে না। নির্বাচনের জন্য প্রকৃত প্রস্তুতিমূলক কর্মকান্ড বাদ দিয়ে কিছু অপ্রয়োজনীয় ও অবাস্তবায়নযোগ্য ইস্যু তুলে অর্থহীন বিতর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে 'সময় ক্ষেপনের' অভিযোগ উঠছে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। সংস্কার প্রস্তাবের তালিকায় এক এক সময়ে এক ধরণের চমক সৃষ্টিকারী ধারা যোগ হচ্ছে। যেমন বলা হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটিতে কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য থাকতে হবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, নির্বাচন কমিশনের তিনজন কমিশনারের মধ্যে কিন্তু একজনও নারী নেই। ১১ সদস্যের উপদেষ্টামন্ডলীর মধ্যে নারী মাত্র একজন যিনি আবার প্রধান উপদেষ্টার ভাবী। আত্মীয়

স্বজন নিয়েও যারা অতি ক্ষুদ্র পরিসরে জেন্ডার ব্যালান্স করতে পারে না, তারা কিভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর বিশাল পরিসরে এ ধরণের শর্ত জুড়ে দিচ্ছেন তা বোধগম্য নয়।

নির্বাচন কমিশন ও সরকারকে বুঝতে হবে যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভোটার তালিকা তৈরীতে যে কোন ধরণের ব্যর্থতা জাতিকে একটি অকল্পনীয় অরাজকতার দিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বিগত কয়েক মাসের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। মামলা করে, সর্বাত্মক অসহযোগিতা তৈরী করে, মিডিয়ার প্রচারণা চালিয়ে এবং সর্বশেষে বিদেশী রাষ্ট্রদূত ও সংস্থাকে ব্যবহার করে একটি রাজনৈতিক শক্তি পূর্বের ভোটার তালিকাকে পদে পদে বাধাগ্রস্থ ও বিতর্কিত করেছে। কারণ ছিল, তারা সেই পরিস্থিতিতে নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ছিল না। উক্ত শক্তিটি তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই এতেই থেমে থাকে নি। ২৮ অক্টোবর থেকে ১১ জানুয়ারী পর্যন্ত সারাদেশে যে তান্ডবলীলা তারা চালিয়েছে তা কাউকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। সেই অরাজকতার সুফল যে তারা পেয়েছে তা তাদের নেত্রী কোন রাকঢাক না রেখেই বলে বেড়াচ্ছেন।

উক্ত রাজনৈতিক শক্তিটির বিশ্লেষণ হচ্ছে, বর্তমানের পরিস্থিতি তাদের বিজয়ের জন্য সব থেকে উপযোগী। ইতোমধ্যে তারা অতি দ্রুত নির্বাচনের জন্য দাবী তুলছে এবং তাদের দাবীর স্বপক্ষে শক্তিশালী দেশগুলোর মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করছে। এদিকে ক্ষমতাশীনদের সহায়তায় ও সমর্থনে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের তোড়জোড় চলছে। এ ধরণের একটি দল গঠিত হলে উক্ত রাজনৈতিক শক্তির বিজয়ের সম্ভাবনা কমে যাবে। তখন কি তারা বসে থাকবে? অথবা, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী 'ভয়ে চুপসে যাওয়া' দলটির একটু উঠে দাড়ানোর সম্ভাবনা দেখা দিলে তারা কি আর অপেক্ষা করতে চাইবে? পূর্ব অভিজ্ঞতা তা বলে না। বিজয়ের এতো কাছাকাছি এসে তারা খালি হাতে কখনোই ফিরে যেতে চাইবে না। মনে রাখতে হবে, লাঠি বৈঠার মাধ্যমে অরাজকতা সৃষ্টি করে তারা সফল ও পুরস্কৃত হয়েছে। রাজধানীতে প্রকাশ্যে টিভি ক্যামেরার সামনে মানুষ হত্যা করে মরদেহের উপর নৃত্য করার মত পাশবিকতা প্রদর্শন করার পরও তাদের গায়ে আচড়টি লাগেনি। বরং তারা, তাদের ভাষায় তাদের প্রত্যাশিত সরকার আনতে পেরেছে। প্রকাশ্য অপরাধ করে পুরস্কৃত হওয়ার কারণেই বাংলাভাই তৈরী হয়েছিল। প্রকাশ্য অপরাধের শাস্তি না হয়ে বরং পুরস্কার দেয়া হলে অপরাধীর মাত্রাজ্ঞান লোপ পায় এবং সে ব্যাপক আকারের অপরাধ করতে পিছপা হয় না। ফলে ক্ষমতার মসনদ নাগালের মধ্যে এসে চলে যেতে দেখলে স্বাভাবিকভাবেই তারা লাঠি বৈঠার চেয়েও মারাত্মক কোন অরাজকতার পথ বেছে নেবে। ২৮ অক্টোবর ও তার পরবর্তী অরাজকতার দিনগুলোতে জনগণের জন্য শেষ ভরসার স্থল ছিল সেনাবাহিনী। জরুরী অবস্থার প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন তারই প্রতিফলন। বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকার 'সেনা-সমর্থিত' হিসাবে দেশে-বিদেশে পরিচিত। আগামীতে আরেকটি এবং অধিকতর ভয়াবহ অরাজকতা সৃষ্টি হলে তার দায় দায়িত্ব বর্তমান সরকারের উপরে পড়বে এবং এ সরকারের সমর্থনকারী হিসাবে সেনাবাহিনীকেও বিতর্কিত করে তুলবে। শেষ ভরসার স্থলটি হারালে দীর্ঘস্থায়ী বিশৃঙ্খলায় নিপতিত হওয়া এবং জাতির স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। নির্বাচন কমিশন, সরকারের নীতি নির্ধারকগণ ও সরকারকে সমর্থনকারীদেরকে বিষয়টি অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় এবং অনুরাগ-বিরাগ ভুলে বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে।